সমস্যা, শিক্ষা মানের অবনতি, প্রশাসনিক ও আর্থিক নৈরাজ্য ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে শিক্ষা কমিশন সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে উক্ত কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনে শিক্ষা বোর্ডগুলি তাদের কর্মচারীদের ইচ্ছা ও মর্জির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কর্মচারীদের নিত্যনৈমিত্তিক দাবী-দাওয়া ও আচার ব্যবহার শিক্ষা বোর্ডগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে হরহামেশা অভিযোগ পাওয়া যায়। একশ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজসে জাল সার্টিফিকেট তৈরি ও বিক্রির বিষয় কারো অজানা নেই।

শিক্ষা বোর্ডগুলির কর্মচারীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ স্থানীয় লোক। ঢাকাস্থ শিক্ষাবোর্ডগুলি এ ব্যাপারে কিছুটা ব্যতিক্রমী। শিক্ষা বোর্ডগুলিতে স্থানীয় প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। কর্মচারীদের বদলীর কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা নেই। জাতীয়-ভিত্তিক চিন্তাধারা ও বিচার বিবেচনার অবকাশ তাদের কম। সরাসরি নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাইরে থেকে প্রেষণে (ডেপুটেশন) কারো পোস্টিং শিক্ষাবোর্ডসমূহের কর্মচারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও শিক্ষা বোর্ডগুলিতে নৈরাজ্য বিরাজমান। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম ও আইন-কানুনাদি মেনে না চলা শিক্ষাবোর্ডসমূহের রীতি ও নীতিতে পরিণত হয়েছে। অনিয়মিতভাবে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি প্রদান, ও বেতন নির্ধারণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো দুর্বল করে ফেলেছে। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সময়, পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকদের মধ্যে বন্টন করার সময় ও ফল প্রকাশের সময় সাধারণত বোর্ড কর্মচারীরা নানা দাবীতে ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদি আরম্ভ করে। তারা প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রায় অচল করে দেয়। এতে পরীক্ষার্থী শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শিক্ষা কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছে যে প্রায় সবকিছুতে অভিন্নতা ও সমতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মানের দিক দিয়ে সকল শিক্ষা বোর্ডে অভিন্নতা বজায় রয়েছে কিনা তা বিবেচনার বিষয়। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিক শিক্ষা বোর্ড চালু রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।